১৩১৫

পূর্ব ও পশ্চিম

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস।

একদিন যে শ্বেতকায় আর্যগণ প্রকৃতির এবং মানুষের সমস্ত দুরূহ বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে অন্ধকারময় সুবিস্তীর্ণ অরণ্য এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল তাহাকে একটা নিবিড় যবনিকার মতো সরাইয়া দিয়া ফলশস্যে-বিচিত্র আলোকময় উন্মুক্ত রঙ্গভূমি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি শক্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসের ভিত্তিরচনা করিয়াছিল। কিন্তু, এ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভারতবর্ষ।

আর্যরা অনার্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম যুগে আর্যদের প্রভাব যখন অক্ষুণ্ন ছিল, তখনো অনার্য শূদ্রদের সহিত তাঁহাদের প্রতিলোম বিবাহ চলিতেছিল। তার পর বৌদ্ধযুগে এই মিশ্রণ আরো অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের অবসানে যখন হিন্দুসমাজ আপনার বেড়াগুলি পুনঃসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং খুব শক্ত পাথর দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তখন দেশের অনেক স্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ক্রিয়াকর্ম পালন করিবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল ; অনেক স্থলে ভিন্নদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে, এবং অনেকস্থলে রাজাজ্ঞায় উপবীত পরাইয়া ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইয়াছে, এ কথা প্রসিদ্ধ। বর্ণের যে-শুভ্রতা লইয়া একদিন আর্যরা গৌরব বোধ করিয়াছিলেন সে-শুভ্রতা মলিন হইয়াছে ; এবং আর্যগণ শূদ্রদের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের বিবিধ আচার ও ধর্ম, দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ রচিত হইয়াছে ; বৈদিক সমাজের সহিত কেবল যে তাহার ঐক্য নাই তাহা নহে অনেক বিরোধও আছে।

অতীতের সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস। হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এ দেশে প্রবেশ করিল, চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

যদি এইখানেই ছেদ দিয়া বলি, বাস্‌, আর নয়-- ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা হিন্দুমুসলমানেরই ইতিহাস করিয়া তুলিব, তবে, যে-বিশ্বকর্মা মানবসমাজকে সংকীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশই বৃহৎ পরিধির দিকে গড়িয়া তুলিতেছেন, তিনি কি তাঁহার প্ল্যান বদলাইয়া আমাদেরই অহংকারকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে, কি আর কোনো জাত আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সব চেয়ে বড়ো করিয়া আলোচিত হইতেছে, তাহা নহে। তাঁহার আদালতে নানা পক্ষের উকিল নানা পক্ষের দরখাস্ত লইয়া লড়াই করিতেছে, অবশেষে একদিন মকদ্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দু নয় মুসলমান নয় ইংরেজ নয় আর-কোনো জাতি চূড়ান্ত ডিক্রি পাইয়া নিশান-গাড়ি করিয়া বসিবে, এ কথা সত্য নহে। আমরা মনে

করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহংকার ; লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহা সকলকে লইয়া ; এবং তাহাই নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে-- আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমরা যে-পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে ; নিজেকেই-- ব্যক্তি হিসাবেই হউক আর জাতি হিসাবেই হউক-- জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। গ্রীসের জয়পতাকা আলেকজাণ্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে যে একচ্ছত্র করিতে পারে নাই, তাহাতে গ্রীসের দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে ; পৃথিবীতে আজ সে দম্ভের মূল্য কী। রোমের বিশ্বসাম্রাজ্যের আয়োজন বর্বরের সংঘাতে ফাটিয়া খান্‌খান্‌ হইয়া সমস্ত য়ুরোপময় যে বিকীর্ণ হইল, তাহাতে রোমকের অহংকার অসম্পূর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে। গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে ; কিন্তু তাহারা নিজেরাও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই, তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব করিয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এ-ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এ দেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে-- ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে, আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে-খণ্ড সামগ্রী কোনোমতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টিঁকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই নই, যে-সমগ্র রচিত হইতেছে তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট, ক্ষুদ্রকে সে-ই ত্যাগ করিয়া বৃহতের মধ্যে রক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষেরও যে-অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো-একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য-সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারি দিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত-ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন, নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জন করিবেন। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত ; আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি, তবে আমরাই নষ্ট হইব। আমরা সর্বপ্রকারে সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে স্বতন্ত্র থাকিব, এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজাক্ষেত্রে আর-কেহ পদার্পণ করিবে না, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে, তবে না জানিয়া

আমরা এই কথাই বলি যে, বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া আছে-- এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর-একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে ; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্বেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা তো পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। যাহারা প্রপিতামহদের মধ্যেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন্ বর্তমানের তাড়নায়, কোন্ ভবিষ্যতের আশ্বাসে। পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে-প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা পরিবর্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্‌ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে ; আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মতো জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে-পর্যন্ত না সফল হইবে, জগতযজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে-পর্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে-পর্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।

ইংরেজের আহ্বান যে-পর্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে-পর্যন্ত না সার্থক হইবে, সে-পর্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে-ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ-- আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে। বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে। এ কি আমাদের ভারতবর্ষ। সেই আমরা কাহারা। সে কি বাঙালি, না মারাঠি, না পাঞ্জাবি, হিন্দু না মুসলমান ? একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী-- সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড আমরা'র মধ্যে যে-কেহই মিলিত হইক, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরো কেহ আসিয়াই এক হউক না, তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না, এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো

প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে, পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন ; আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন ; আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর ; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে ; পৃথিবীর যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন ; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস কোনো ক্ষুদ্র অহংকারবশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই ; যে-অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে রানাডে পূব-পশ্চিমের সেতুবন্ধনকার্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি সেই মিলনতত্ত্ব রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল ; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহারবিরোধ ও স্বার্থসংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভ ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত-ইতিহাসের যে-উপকরণ ইংরেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতাসাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল ; সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এ-সাহিত্য সেই-সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে পূব-পশ্চিমের আদানপ্রদানের

রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি করিয়া আমরা যে দিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।

শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল বল লাভ করা। এমন করিয়া যে-জিনিসটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব, ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ন হইতেছে, সুতরাং সর্বপ্রকার শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্বত্রই বাধা পাইতেছে ; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হইতছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।

সেই ধর্মবুদ্ধি হইতে এই মিলনচেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্মবুদ্ধি তো কোনো ক্ষুদ্র অহংকার বা প্রয়োজনের মধ্যে বদ্ধ নহে। সেই বুদ্ধির অনুগত হইলে আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এই চেষ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষের করিয়া লইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত হইবে।

সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষিত, এমন-কি অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে আমরা কী ভাবে গ্রহণ করিব। তাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই। কেবল তাহা কয়েকজন চক্রান্তকারীর ইন্দ্রজাল মাত্র ? ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানা জাতি ও নানা শক্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সম্মিলনে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে বর্তমান বিরোধের আবর্ত কি একেবারেই তাহার প্রতিকূল। এই বিরোধের তাৎপর্য কী তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বে বিরোধকেও মিলনসাধনার একটা অঙ্গ বলা হয়। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না। এইজন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল ; এমন করিয়া যথার্থভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বলো আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বলো, তাহা উপার্জনের অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলব্ধি ঘটে ; কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যে-ভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সে-ভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।

এইজন্যই কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া নিজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

যে-মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়াই এই আত্মাভিমানের

প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমরা নির্বিচারে নির্বিরোধে দুর্বলভাবে দীনভাবে যাহা লইতেছিলাম, তাহা যাচাই করিয়া তাহার মূল্য বুঝিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না, তাহা বাহিরের জিনিস পোশাকী জিনিস হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্‌বর্তনের তাড়না আসিয়াছে।

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই ; তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না, এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন ; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল ; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।

যে-শক্তি নব্যভারতের আদি-অধিনায়কের প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণে সেই চেষ্টা পর্যায়ক্রমে বিপরীত সীমার চূড়ান্তে গিয়া ঠেকিতেছে। একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতায় আমাদের গতিকে আঘাত করিতে করিতে আমাদিগকে লক্ষ্যপথে লইয়া চলিয়াছে।

বর্তমানে ইংরেজ-ভারতবাসীর যে-বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা কারণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ; ইংরেজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেষ্টভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই পীড়ার মাত্রা অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাৎ দেশের অন্তঃকরণ প্রবলবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কারণ শুধু এই একটিমাত্র নহে। ভারতবর্ষের গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; তাহাকে কোনোমতেই ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে পারিব না, তাহাকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের তরফে সেই আপন করিয়া লইবার আত্মশক্তির যদি অভাব ঘটে, তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করিবে। আবার অন্যপক্ষেও পশ্চিম যদি নিজেকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে, তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানত আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি, যে-ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে-ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি, তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই। এরূপ স্থলে প্রবল পক্ষ সিডিশনের আইন করিয়া দুর্বল পক্ষের অসন্তোষকে লোহার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসন্তোষকে বাঁধিয়াই রাখা হইবে, তাহাকে দূর করা হইবে না। অথচ এই অসন্তোষ কেবল এক পক্ষের নহে। ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজের কোনোই আনন্দ নাই। ভারতবাসীর অস্তিত্বকে ইংরেজ ক্লেশকর বলিয়া সর্বতোভাবে পরিহার করিবারই চেষ্টা করে। একদা ডেভিড হেয়ারের মতো মাহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংরেজচরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন ; তখনকার ছাত্রগণ সত্যই ইংরেজজাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। এখন ইংরেজ অধ্যাপক স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে, তাঁহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে খর্ব করিয়া ইংরেজের দিক হইতে বাল্যকাল হইতে আমাদের মনকে বিমুখ

করিয়া দেন। তাহার ফল এই হইয়াছে, পূর্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্য ইংরেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্ররা তাহা করে না। তাহারা গ্রাস করে, তাহারা ভোগ করে না। সেকালের ছাত্রগণ যেরূপ আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্‌স্‌পীয়র বায়রনের কাব্যরসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বলো, ম্যাজিস্ট্রেট বলো, সদাগর বলো, পুলিসের কর্তা বলো, সকল প্রকার সম্পর্কেই ইংরেজ তাহার ইংরেজি সভ্যতার চরম অভ্যিবক্তির পরিচয় অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না-- সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ-আগমনের যে-সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ, তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে ; আমাদের আত্মশক্তিকে বাধগ্রস্ত এবং আত্মসম্মানকে খর্ব করিতেছে। সুশাসন এবং ভালো আইনই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লাভ তাহা নহে। আপিস আদালত আইন এবং শাসন তো মানুষ নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়-- তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজী আছে। মানুষের পরিবর্তে বিচার এবং আইন, রুটির পরিবর্তে পাথরেরই মতো। সে-পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।

এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিমের সম্যক মিলনের বাধা ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যত-কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্টকর। সুতরাং একদিন-না-একদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা দুর্দম হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেইজন্য ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়।

তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য যে, এ-সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্যভাবেই মিলিতে হইবে, এবং তাহার যাহা-কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত ফল পরিণত হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ তাহাকে বোঁটায় বাঁধা থাকিতে হইবেই, এবং বোঁটায় বাঁধা না থাকিলেও তাহার পরিণতি হইবে না।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরেজের যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ,, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেজন্য আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচাইলে তবেই তাহাদেরও কৃপণতা ঘুচিবে। বাইবেলে লিখিত আছে, যাহার আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে।

সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে ; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। যতদিন তাহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবে, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন হইতে পারিবে না। আমরা রিক্ত হস্তে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে বার বার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড়ো এবং সকলের চেয়ে ভালো তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভালো হয়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্‌বোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোনো সহজ পন্থা নাই। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেজের কাছেও কঠিন দুঃখেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎলাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদের মধ্যেও শক্তির আবশ্যক।

আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকরির লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায়, তাহারা ইংরেজের পাপপ্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে, ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে, ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয় তবে এজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বদেশে ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্ত্বকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারি দিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অশ্রান্তভাবে কাজ করে ; এমনি করিয়া মোটের উপর নিজের নিকট হইতে যত দূর পর্যন্ত পূর্ণফল পাওয়া সম্ভব, ইংরেজ-সমাজ তাহা জাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আদায় করিয়া লইতেছে।

এ দেশে ইংরেজের প্রতি ইংরেজ-সমাজের সেই শক্তি সম্পূর্ণ বলে কাজ করিতে পারে না। এখানে ইংরেজ সমগ্র মানুষের ভাবে কোনো সমাজের সহিত যুক্ত নাই। এখানকার ইংরেজ-সমাজ হয় সিভিলিয়ান-সমাজ, নয় বণিক-সমাজ, নয় সৈনিক-সমাজ। তাহারা তাহাদের বিশেষ কার্যক্ষেত্রে সংকীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ। এই-সকল ক্ষেত্রের সংস্কারসকল সর্বদাই তাহাদের চারি দিকে কঠিন আবরণ রচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শে সেই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারি দিকে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে না। তাহারা এ দেশের হাওয়ায় কেবল কড়া সিভিলিয়ান, পুরা সদাগর এবং ষোলো-আনা সৈনিক হইয়া পাকিয়া উঠিতে থাকে ; এই কারণেই ইহাদের সংস্রবকে আমরা মানুষের সংস্রব বলিয়া অনুভব করিতে পারি না। এইজন্যই যখন কোনো সিভিলিয়ান হাইকোর্টের জজের আসনে বসে তখন আমরা হতাশ হই ; কারণ তখন আমরা জানি এ লোকটির কাছ হইতে যথার্থ বিচারকের বিচার পাইব না, সিভিলিয়ানের বিচারই পাইব ; সে-বিচারের ন্যায়ধর্মের সঙ্গে যেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মের বিরোধ ঘটিবে সেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মই জয়ী হইবে। এই ধর্ম ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষেরও প্রতিকূল।

আবার যে-ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার, সেইভারতবর্ষের সমাজও নিজের দুর্গতি-দুর্বলতাবশতই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্‌বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না ; সেইজন্য যথার্থ ইংরেজ এ দেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে-ফল পাইত সেই ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেইজন্যই পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আপিস আদালতের বড়ো সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্বের মানুষের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এ দেশে যাহা-কিছু বিপ্লব বিরোধ, আমাদের যাহা-কিছু দুঃখ অপমান ; এবং এই যে প্রকাশ পাইতেছে না, এমন-কি , প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সেজন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"-- পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না ; কোনো মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে ; যে-ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহার প্রকৃতিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ হয় না। ত্যাগের দ্বারাই বলের

পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে, এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্যপ্রয়োগ করিয়া দেশের সর্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতিসাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তাবশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল পক্ষ দুর্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্‌ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া, দাবি করিতে পারিব না ; ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্‌বোধিত করিতে পারিব না, এবং ভারতবর্ষ কেবলই বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে। ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে ; নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্‌বোধিত করিতেছে না, এইজন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এইজন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না, সে-মিলনে পূর্ণ ফল জন্মিতেছে না, সে-মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না ; ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টার যোগসাধন হইবে ; তখন বর্তমানে ভারত-ইতিহাসের যে পর্বটা চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে, এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।